মুক্তির উপায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তির উপায়

মুক্তির উপায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো-আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু-জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাণ্ডবদাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই

স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

প্রথম দৃশ্য

ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী

ফকির

সোহহং সোহহং সোহহং।

পুষ্প

ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী।

ফকির

গুরুমন্ত্র।

পুষ্প

কতদূর এগোলো।

ফকির

এই, ইড়া নাড়ীটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল থেমে।

পুষ্প

হঠাৎ থামে কেন।

ফকির

ঐ আমার ছিঁচকাঁদুনি খুকিটার কীর্তি। মন্তরটা গুরগুর গুরগুর করতে করতে দিব্যি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে।

বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হলেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিসুরে চীৎকার করে উঠল— বাবা, নচঞ্চুস্। দিলুম ঠাস করে গালে এক চড়, ভ্যাঁ করে উঠল কেঁদে, অমনি এক চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভিগহ্বর পর্যন্ত। সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

তোমার গুরুর মন্তরটা কি অজীর্ণরোগের মতো। নাড়ীর মধ্যে গিয়ে—

ফকির

হাঁ দিদি, নাড়ীর মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই— ওটা বায়ু কিনা।

পুষ্প

বায়ু নাকি।

ফকির

তা না তো কী। শব্দব্রহ্ম— ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যখন কেবলই বায়ু খেতেন তখন কেবলই বানাতেন মন্তর।

পুষ্প

বল কী।

ফকির

নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ী যেত পটপট করে ছিঁড়ে বিশখানা হয়ে।

পুষ্প

উঃ, তাই তো বটে— একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র— কম হাওয়া তো লাগে নি।

ফকির

শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ-যে ও—ম্‌, ওটা তো নিছক বায়ু-উদ্‌গার। পুণ্যবায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পুষ্প

এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির

সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী— মন্ত্রগঙ্গা বেরচ্ছে কল্‌কল্‌ করে।

পুষ্প

বি. এ-তে সংস্কৃতে অনার্স্‌ নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকযন্ত্রের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির

এতেই বুঝে নাও— গুরুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ীর মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুষ্প

আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির

তা বাড়ে বটে।

পুষ্প

গুরু কী বলেন।

ফকির

তিনি বলেন পেটের মধ্যে স্থূলে সূক্ষ্মে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি-বর্ষণ, নাড়ীগুলো উচ্চস্বরে গুরুকে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম

দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গুরুর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুষ্প

চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামীর কণ্ঠ যখন চলে, সাধ্বীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি ?

হৈম

তোমরা দুজনে তত্ত্বকথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললুম।

প্রস্থান

ফকির

আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে গুরু-পাক। খুব বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে ; নাচের ঘূর্ণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে ; আর ঘানি ঘুরলে যেরকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখো-না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাধার থেকে— উঃ!

পুষ্প

কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি।

ফকির

কিছু করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরুর মন্ত্রটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, দুটোরই খুব দরকার।

উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য

গুরুচরণ করো শরণ-অ
ভবতরঙ্গ হবে তরণ-অ
সুধাক্ষরণ প্রাণভরণ-অ
মরণ-ভয় হবে হরণ-অ।

পুষ্প

শুধু মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গুরুদক্ষিণার চোটে স্ত্রীর

গয়না, বাপের তহবিল-হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির

ঐ দেখো, বাবা আসছেন বউকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত। গুরো।

পুষ্প

ব্যাঘাতটা কিসের।

ফকির

স্থূলরূপে ওঁরা আমাকে ফকির বলেই জানেন।

পুষ্প

আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির

ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের সূক্ষ্মরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুষ্প

খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির

দৃষ্টিশুদ্ধি হতে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎ-কৃপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন— তখন বাবা—

পুষ্প

তখন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

ফকিরের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর

হৈমর প্রতি

বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো ওর কিছু হল না।

পুষ্প

আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধরে যায়।

বিশ্বেশ্বর

ম্যাকিননের হেডবাবু আমার বন্ধুর শ্যালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হয় একটা কিছু পাস করলেই তাকে অ্যাসিস্টেন্ট স্টোর্‌কীপার করে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ করেই বারে বারে ফেল করতে ল্যাগল।

পুষ্প

ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল। ম্যাট্রিকের এ-পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধরে

ঝিঁকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়— স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর

যাও পড়তে, কিন্তু শোনো মা— ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন।

হৈম

কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশান্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর

ঐ দেখো-না, একটা রোঁওয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় করে বকছে। এই ফকির, শুনে যা, বাঁদর। শুনে যা বলছি।

পুষ্প

মেসোমশায়, তোমার বুঝি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে।

বিশ্বেশ্বর

সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না-মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখো-না, ওখানটায় কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল, তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প

ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছুতেই নেবে না, যার দিব্যদৃষ্টি আছে সে চোখ বুজলেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্মা চুরুটের প্যাক্‌বাক্সে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্য রূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দার্জিলিং-চায়ের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর

আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার-মিক্‌শ্চারের অদৃশ্য রূপ ভরে রেখেছে নাকি!

পুষ্প

বল্‌-না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে।

হৈম

দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধে স্নান করে তিন চুমুক করে খান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার সংসার-

খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই, আমার কাজ আছে।

প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর

ওরে ও ফক্‌রে!

পুষ্প

আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি।

কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে

ও ফকিরদা, করেছ কী।

ফকির

কেন, কী হয়েছে।

পুষ্প

গুরু হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির

লাফ দিয়ে উঠে

এঃ, ছি ছি, করেছি কী!

পুষ্প

হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে—সেখানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম।

ফকির

বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে

ক্ষমা কোরো গুরু, ক্ষমা কোরো— এ অণ্ড জগৎব্রহ্মাণ্ডের বিগ্রহ ; এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিকপালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প

চাদর চেপে ধ'রে

এনো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও।

চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে

বিশ্বেশ্বর

বাপু, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির

কী আদেশ করেন।

বিশ্বেশ্বর

আর-একবার পাস করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির

পারব না বাবা।

বিশ্বেশ্বর

কী পারবি নে। পাস করতে, না, পাস করবার চেষ্টা করতে ?

ফকির

চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

বিশ্বেশ্বর

কেন হবে না।

ফকির

গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস, তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর

লক্ষ্মীছাড়া! কী করে চলবে তোমার! আমার পেনশনের উপর? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— বউমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা!

ফকির

আমি নিজের জন্যে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর

তবে নিস কার জন্যে।

ফকির

ওঁরই সদ্‌গতির জন্যে।

বিশ্বেশ্বর

বটে? তার মানে?

ফকির

আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর

অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁটিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শুকিয়ে।

ফকির

আমি কিছুই জানি নে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে

যা করেন গুরু।

বিশ্বেশ্বর

বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে।

প্রস্থান। হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির

কা তব কান্তা—

হৈম

কী বকছ।

ফকির

কা তব কান্তা। কোন্ কান্‌তা হ্যায়।

হৈম

হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বলো।

ফকির

বলি, কাঁদছে কে।

হৈম

তোমারই মেয়ে মিস্ত।

ফকির

হায় রে, একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈম

কাকে বলে সংসার।

ফকির

তোমাকে।

হৈম

আর, তুমি কী? মুক্তির জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফকির

গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈম

আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতান্ন পাকে।

ফকির

মেয়েমানুষ— কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা! কামিনী কাঞ্চন—

হৈম

দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাঞ্চনের দাম তোমার গুরুজি কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর, কামিনীর কথা বলছ! ঐ মূর্খ কামিনীগুলোই পায়ের

ধুলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না ঢালত তা হলে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাঞ্চনের বাঁধন খসল তোমার। শ্বশুরমশায় আমাকে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

পুষ্পর প্রবেশ

পুষ্প

ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডূক্যোপনিষৎ! অনিদ্রার পাঁচন নাকি!

ফকির

ঈষৎ হেসে

তোমরা কী বুঝবে— মেয়েমানুষ!

পুষ্প

কৃপা করে বুঝিয়ে দিতে দোষ কী!

ফকির হাস্যমুখে নীরব

হৈম

কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাত্তিরে ঘুমোন।

পুষ্প

বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুমের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির

গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প

ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির

এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে সুষুম্না নাড়ীর পাকে পাকে।

পুষ্প

সেজন্যে ঘুমের দরকার ?

ফকির

খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, দুপুরবেলা আহারের পর ভগবদ্‌গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়— গভীর নিদ্রা। বারণ করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিঙ্গলার মধ্য দিয়ে শ্লোক-গুলো অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, মূঢ়দের নাক ডাকে, ইড়াপিঙ্গলা ডাকে জ্ঞানীদের— নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপুর আর চৌরঙ্গী।

পুষ্প

ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপিঙ্গলা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে।

হৈম

খুব জোরে। মনে হয়, পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাঙ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ফকির

ঐ দেখো, শুনলে পুষ্পদিদি? আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কথা না জেনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি বলে দিয়েছেন, মাণ্ডূক্য উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাত্মা চরম অবস্থায় নাভিগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কূপমণ্ডূক, চার দিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখনি পেটের মধ্যে কেবলই শিবোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং করে নাড়ীগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি— যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম

একদিন মিন্তু কেঁদে উঠে ওঁর সেই ব্যাঙডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খুন করেন আর কি!

পুষ্প

ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডূক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হত। হাঁচির চোটে

নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো-আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি, গুরুর ফুঁয়ের জোরে অজ্ঞানসমুদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির

ঈষৎ হেসে

অধিকারভেদ আছে।

পুষ্প

আছে বৈকি। দেখো-না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্‌-এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলেছেন, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ— এর আত্মাটা চার-পা-ওয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে দু-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিস্‌, আর-কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম

কী জানি ভাই, কিন্তু দৈবাৎ ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

পুষ্প

হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির

সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

ফকিরদা, তপস্যা যখন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাত্রীর কাছে— তোমার তপস্যা এবার গুটিয়ে নাও; এই

দেখো, বরদাত্রী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈম

পুষ্পদিদি, বরদাত্রীর জন্যে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রং বেরঙের।

পুষ্প

বুঝেছি, গেরুয়া রঙের ছটা বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈম

এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি-একটি করে বর-দাত্রী। গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে। হবি তো হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল— দুটো-একটা খাঁটি কথা শুনিয়ে-ছিলুম, মুক্তিমন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির

দেখো, আমার মাণ্ডুক্যটা দাও।

পুষ্প

কী করবে।

ফকির

নারীর হাত লেগেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প

সেই ভালো, বুদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হল না এ জন্মে।

ফকির

শুনে যাও, হৈম। আজকে গুরুগৃহে নবরত্নদান ব্রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

হৈম

দিতে পারব না, শ্বশুরমশায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন।

পুষ্প

তোমার গুরুজির বুঝি কাঞ্চনে অরুচি নেই!

ফকির

তাঁর মহিমা কী বুঝবে তোমরা! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির মধ্যে আর তিনি চোখ বুজে বলেন— হুং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

পুষ্প

ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন।

ফকির

হায় রে, এইটেই বুঝলে না! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই

করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থূল সোনার কামনা ভস্ম করে কানে দেবেন সূক্ষ্ম শোনা, গুরুমন্ত্র।

পুষ্প

আর সহ্য হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে।

ফকির

সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে

রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই। ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির

হাঁ, তিনি শুনেছেন, তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুষ্প

বুঝতে পারছি ক'দিন ধরে কেবলই বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির

নাচছে? বটে! ঐ দেখো, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

পুষ্প

কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার মতো মালমসলা আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে য়ুনিভার্সিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈম

কী বলছ ভাই, পুষ্পদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল।

পুষ্প

কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বুদ্ধিতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুগুরুনি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান শুনেছিলুম—

গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির

পুষ্পদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি।

পুষ্প

নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবুদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে— তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির

উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই— কী বলব!

পুষ্প

একেবারে শেষের দিক থেকেই শুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যখনি জাগিলে বিশ্বে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

ফকির

বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর— আমি তো কখনো পড়ি নি।

পুষ্প

ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার দুনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম

কী বল দিদি! ও যে আমার শাশুড়ির দেওয়া!

পুষ্প

এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ির দেওয়া, এও যেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে নাহয়।

ফকির

অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ করো, গুরুচরণে নিবেদন করো যা কিছু আছে তোমার।

পুষ্প

হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির

আহা, বিশ্বাস— বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলেটার নাম দেব— অমূল্যধন বিশ্বাস!

পুষ্প

হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরু-কৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুধাম

[শিষ্যশিষ্যাপরিবৃত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধূপধুনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে— গুরো। গুরুর চক্ষু মুদিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুচছে। দুজন দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ]

গুরু

হঠাৎ চোখ খুলে

এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিদ্ধিরস্তু সিদ্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক

মন তো প'ড়েই আছে গুরুর চরণে।

শিষ্যাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না

গুরু

আজ তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হল তিনের দরজা। শিবোঽহং শিবোঽহং

শিবোহহং। এইটে কোনোমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উচ্চুরি-রুগির পেটের মতো, তারা এই সরু দরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে

হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু

এইখেনে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তার পরে এক দুই তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্— হয়ে গেল, ডুবল নৌকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং হ্রিং ক্রম্।

সকলে

হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু

এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হালকা হয়েছে যদি দেখি, তা হলে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধরো।

গুরুপদে মন করো অর্পণ,
ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে—
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর
ভবের দোলায় দুলিতে।
হিসাবের খাতা নাড় ব'সে ব'সে,
মহাজনে নেয় সুদ কষে কষে—

খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে

কেন থাক হায় ভুলিতে,

দিন চলে যায় ট্যাঁকে টাকা হায়

কেবলি খুলিতে তুলিতে

গুরু

কী নিতাই, চুপ করে বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি। আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই

তা, গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি করে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্দজোড়া এনেছি।

গুরু

এনেছ, তবে আর ভাবনা কী।

নিতাই

প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা করে দূর করে দেবে।

গুরু

সেজন্যে এত ভয় কেন।

নিতাই

এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গুরু

নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব— ঝগড়া ছুদিনে

যাবে মিটে।

নিতাই

ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা, বরঞ্চ যদি অনুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গুরু

দোষ কী! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায়। সেইরকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব

তার মানে একাই এক সহস্র।

গুরু

উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড়ো বড়ো সজ্জন কুলীন বহু কষ্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই-জন্যেই এ দেশকে বলে পুণ্যভূমি— পুণ্য বিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব

আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনি নি।

গুরু

কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে— সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে; সব

ছাই, সব ছাই ?

মাধব

জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল মনের মধ্যে।

গুরুর পা জড়িয়ে ধ'রে

প্রভু, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু

এই রে! মোলো, মোলো দেখছি। সর্বনাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা!

ঝুলি এগিয়ে দিয়ে

ফেল্, ফেল্ বল্‌ছি, এখ্‌খনি ফেল্।

মাধব বহু কষ্টে কম্পিত হস্তে রুমাল থেকে মোহর
খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল

এইবার সবাই মিলে বলো দেখি—

সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই।

নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।

নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই।

সকলের চীৎকারস্বরে আবৃত্তি

এই-যে মা তারিণী! এসো এসো, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক।

তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ
মাথা ঠেকিয়ে রাখল। গুরু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

গুরুভার বটে— বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল মনটাকে। যাকগে, এতদিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন— ঠিক কিনা, মা ?

তারিণী

খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরু

মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আল্‌গা হতে শুরু করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী

না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশুড়ির আমলের গয়নাগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গুরু

থলির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে

আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক্। তোমরা বলো সবাই— সোনা ছাই ··

সকলের আবৃত্তি

আরে বলদেও, ক্যা খবর ?

বলদেও

পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে

খবর আঁখসে দেখ্‌ লিজিয়ে হজরৎ।

গুরু

ভালা ভালা, দিল্ তো খুশ হ্যায় ?

বলদেও

পহেলা তো বহুৎ ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়া লিয়া কি, কুছ্ নেই, কুছ্ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ কাগজ হ্যায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগ্‌সে জ্বল্ জাতা, পানীমেসে গল্ জাতা, ইস্‌কো কিম্মৎ কৌড়িসে ভি কমতি হ্যায়। লিকেন আত্মারাম সারা বখৎ গড়বড় কর্‌তে থে। মেরে ঐসী বুদ্ধি লগি ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে পাঁও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হ্যায়— ইস্‌সে দো এক রুপৈয়া ভি অচ্ছি হ্যায়। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাঙ যব পী লিয়া, তব সব দুরস্ত হো গয়া। মেরে দিল হালকা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক।

গুরু

জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব ঝুটো, সব ঝুটো, সব ঝুটো—
ওরা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো—
ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো।

সকলের আবৃত্তি

গুরু

আজ ফকিরকে দেখছি নে যে বড়ো।

বলদেও

এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হ্যায়। নয়া আদমি, হমারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি— ইস্‌বাস্তে দোনাকো বাহার খাড়া রখ্‌খা হ্যায়। হুকুম মিল্‌নেসে লে আয়গা।

গুরু

কী সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্‌খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ

গুরু

এসো এসো, মা এসো। মুখ দেখেই বুঝছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুষ্প

ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাঁকে দেখছেন, এত বড়ো বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল— গুরুর আশীর্বাদে চিহ্নমাত্রই নেই।

গুরু

এ-সব কথার অর্থ কি!

পুষ্প

অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনেছি, আপনার এখানে সকল রকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে।

ফকির

অ্যাঁ, এ-সব কথা কী বলছ, পুষ্পদি। ঐ তো সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল— গুরুচরণে রাখবে না ?

পুষ্প

রাখব বৈকি।

গুরুর হাতে দিয়ে

তৃপ্ত হলেন তো ?

গুরু

হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে

আমার অতি যৎসামান্যেই তৃপ্তি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং।

ফকির

ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুষ্প

ভুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওঁর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনি আসছে মথ্‌লুগঞ্জের বড়ো দারোগা দবিরুদ্দিন সাহেব।

গুরু

দাঁড়িয়ে উঠে

কী সর্বনাশ !

পুষ্প

কোনো ভয় নেই, এখ্‌খনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু

কাতরস্বরে

বলদেও !

বলদেও

লাঠি বাগিয়ে

কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হুকুমসে হম লড়াই করেঙ্গে।

মথুর

গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাত্মার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে !

গুরু

অ্যাঁ, বল কী মথুর ! পালাব কোথায় ! ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে

কেউ না, কেউ না।

তারিণী

আমার বালাজোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু

এখ্‌খনি, এখ্‌খনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও, বাবা।

বলদেও

অব ভি তো নেই সকেঙ্গে। পুলিস চলা জানেসে পিছে লেউঙ্গা।

পুষ্প

আচ্ছা, আমারই হাতে ঝুলিটা দিন। পুলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথুর

ওরে বাস্‌ রে, স্পাই রে স্পাই। কারো রক্ষা নেই আজ।

গুরু

স্পাই! সর্বনাশ!

ঊর্ধ্বশ্বাসে

চললুম আমি। মোটরটা আছে?

একজন

আছে।

ফকির

পায়ে ধরে

প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গুরু

দূর দূর দূর। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষ্মীছাড়া! হতভাগা!

ফকির

তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথায় গতি!

গুরু

তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

দ্রুত প্রস্থান

বিপিন

মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই

আর আমার আছে বাজুবন্দ।

পুষ্প

এই নাও তোমরা।

সকলে

তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও

মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্‌কে বখৎমে থোড়ি দের হ্যায়।

পুষ্প

এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে তো ?

বলদেও

জরুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, দুস্রা লেনে-ওয়ালা কোই হ্যায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভস্‌ম হো জায়গা, উস্‌কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পুণ্য ঔর পুলিসকী ডাণ্ডা ফরক্‌ রহেগা। অভি দেখ্‌তা হুঁ কি হিসাবকি থোড়ি গলতি থী। হর হর, বোম্‌ বোম্‌।

প্রস্থান

পুষ্প

ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। গুরুর পদধূলি তো আঠারো-আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফকির

যাব না।

পুষ্প

কোথায় যাবে !

ফকির

রাস্তায়।

পুষ্প

আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে।

ফকির

সে আমার সঙ্গে আছে।

পুষ্প

কিন্তু, তোমার গুরু ?

ফকির

রইলেন, আমার অন্তরে।

পুষ্প

আর, ডিমের খোলাটা ?

ফকির

সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা বুকের কাছে।

প্রস্থান

পুষ্প

পিছন থেকে

সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

হৈমর প্রবেশ

পুষ্প

বিশ্বাস করতে পারিস নে বুঝি ? এই নে তোর হার।

হৈম

আর অন্যটি ?

পুষ্প

এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম

তার পর ?

পুষ্প

লম্বা দড়ি আছে।

হৈম

আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পুষ্প

তুই হাঁউমাউ করিস নে তো। চতুষ্পদ একটু চরে বেড়াক-না।

হৈম

উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনি বুঝলুম, ফিরবেন না! মণ্ডূক মানে ব্যাঙ বুঝি ভাই?

পুষ্প

হাঁ।

হৈম

উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তখনি বোঝা যায় সে পরমানন্দে আছে।

পুষ্প

তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মা-ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘুমিয়ে নিক।

হৈম

মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পুষ্প

ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ডূক্যকে ফিরিয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

ষষ্ঠীচরণ। পুষ্প

ষষ্ঠী

মা, শরণ নিলুম তোমার।

পুষ্প

খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে— সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে ; আর দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাঁড়া যায় বেঁকে।

ষষ্ঠী

কী না জান তুমি, মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মখ্‌লুগঞ্জ পর্যন্ত সব কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পুষ্প

না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি— ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায়

ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষষ্ঠী

না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বউয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধ'রে-বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুষ্প

এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী

মা, তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড়ো খট্‌কা লাগে—মনে হয়, তুমি দেবতা-ব্রাহ্মণ মানই না।

পুষ্প

কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী

কেন মা, ঐ খুঁতটুকু কেন থেকে যায়।

পুষ্প

সংসারে দেবতা-ব্রাহ্মণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই

করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী

জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াত— কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বসে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুষ্প

নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেবার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী

হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কী বলো তো! কন্‌গ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?

পুষ্প

মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদু ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে— দুদিন বাদেই সিক্‌লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী

ও সর্বনাশ!

পুষ্পা

ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী

কিন্তু, রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে। আমার শ্যালার কাছে—

পুষ্পা

আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জুটে গেছে। দ্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী

বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়েরা যেরকম—

পুষ্পা

অসহ্য, অসহ্য। জামা-শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জাশরম সব গেছে।

ষষ্ঠী

সেদিন কলকতায় গিয়েছিলুম; দেখি, মেয়েরা ট্রামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প

যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না। ও কথা যাক্‌গে— মাখনের জন্যে ভেবো না।

ষষ্ঠী

সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

ষষ্ঠীর প্রস্থান। হৈমর প্রবেশ

হৈম

শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

পুষ্প

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে মামার বাড়িতে।

হৈম

মন টেঁকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পুষ্প

একটু সবুর করো— ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে; একটা ধরতে যাই, ছুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম

আমার তো ছুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প

যেরকম দিনকাল পড়েছে, ছুটো-একটা বাড়তি হাতে রাখা

ভালো। কে জানে কোন্‌টা কখন ফস্‌কে যায়।

হৈম

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পুষ্প

হাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম

তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হনুমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পুষ্প

এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম

তা যেন বুঝলুম, এর মধ্যে হনুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে।

পুষ্প

দল পুরু আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে লেজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম

সাড়া মিলেছে?

পুষ্প

মিলেছে।

হৈম

তার পরে?

পুষ্প

রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম

যা খুশি কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না! ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা— ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

পুষ্প

না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

হৈমর প্রস্থান। সেই লোকের প্রবেশ

পুষ্প

তুমি কে?

সেই লোক

সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পুষ্প

মন্দ তো লাগছে না!

সেই লোক

অর্থাৎ, মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পুষ্প

কিন্তু, সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক

খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর লুকিয়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বুঝতেই পারছ, যাত্রার দলের সরকারি গোঁফদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পুষ্প

এলে যে বড়ো ?

মাখন

চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিশ মাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন, হনুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই— আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয় !

পুষ্প

খাওয়াপরার কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি ?

মাখন

নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিম-ওয়ালা কই মাছের ঝোলের গন্ধস্মৃতি অন্তরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভিরকুটি মিরকুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড়্ ফড়্ করতে থাকে।

পুষ্প

তাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ?

মাখন

না না, মনটা এখনো তত দূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লম্ফ। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম, শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো সূত্রে বুঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পুষ্প

তোমার আঁচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দুবার তৈরি হতে পারে না— ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন

এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি, দিদি। মট্‌রুগঞ্জে চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান ; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্‌ সাহসে— নাক লুকোবে কোথায়। বুঝেছ, দিদি ? আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যাবসা চলে, চোরের ব্যাবসা একেবারে চলে না।

পুষ্প

কিন্তু তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জুড়ি-অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন

অনেক দিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যেস আছে।

পুষ্প

এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হনুমানের পালার তালিম দেবে ?

মাখন

সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম— ঠোঁটের এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই চলল। ভয় হল, বুঝি ব্রহ্মদত্যি হবে। কিন্তু, মুখ দেখে বুঝলুম উপোস করতে হতভাগা তিথিবিচার করছে না।

ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, খাবে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দে ও-গাছের পাখি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পুষ্প

লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন

নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুষ্প

ভালো হল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন

শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পুষ্প

তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দুই-চাকাওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন

দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পুষ্প

ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এসো।

মাখন

আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্ন্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভুল করেছে— বৈরাগীর ব্যাবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলুষ নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানুষ মিলবে না।

পুষ্প

তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাখন

ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা, যার খদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যখন পুরুষরা কাজে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন—

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ। মা-জননীদের তুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা ঝরেছে— তু-চার দিনের সঞ্চয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি তুটো বিয়ে না দিত তা হলে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বুঝতে

পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না, এখন তোমাকে মা-অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুষ্প

সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড্ড বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন

তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গন্ধে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল— সত্যি বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শুঁকে শুঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বারবার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চড়ি। একদিন দিব্যি গেলেছিলুম, এ বাড়িতে কোনোদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পুষ্প

কিসে ভাঙাল।

মাখন

তালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছট্‌ফট্‌ করে কাটালুম। রাত্তিরে যখন সব নিশুতি, বাইরে থেকে ছিট্‌কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে।

খুট্ করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ করে দাঁত খিঁচিয়ে হাঁউমাউখাঁউ করে উঠতেই পতন ও মূর্ছা। বড়োবউ একবার উঁকি মেরেই দিল দৌড়। আমি রয়ে বসে পেট ভরে আহার করে ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুষ্প

কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্যে?

মাখন

অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে খাইয়ে দিতে।

পুষ্প

আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে?

মাখন

দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পুষ্প

লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরো একটা বিয়ে করেছ।

মাখন

তা করেছি।

পুষ্প

পিঠ সুড়্‌সুড়্ করছিল?

মাখন

না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পুষ্প

জেনে নিয়েছ সেটা?

মাখন

বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্যফলে মারা গেল সকাল-সকাল, স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র; কিন্তু ভালো ক'রে মুখ ফোটবার তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পুষ্প

কার কপালে?

মাখন

শক্ত কথা।

চতুর্থ দৃশ্য

নিদ্রামগ্ন ফকির।

মুখের কাছে একছড়া কলা।

জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়েচেড়ে দেখল।

ফকির

আহা, গুরুদেবের কৃপা।

ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে

শিবোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং।

একটা একটা ক'রে গোটা-দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে

আঃ!

মাখনের প্রবেশ

মাখন

কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির

গুরুর চরণ ভরসা।

মাখন

গুরুই খুঁজে মরছি। সদ্‌গুরু মেলে না তো। দয়া হবে কি নেবে কি অভাজনকে।

ফকির

ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন

কান্নার স্বরে

সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল! বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির

গুরুপদে মন স্থির করো— শিবোহহং।

মাখন

এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হলে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির

তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সন্তুষ্ট হলুম!

মাখন

শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা সুদ্ধ উদ্ধার পাক্।

ফকির

ব্যগ্রভাবে আহার

আহা, সুস্বাদ বটে। ভক্তির দান কিনা।

মাখন

সার্থক হল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁয়ারা খবর পেলে কী খুশিই হবেন! যাই, ওঁদের সংবাদ পাঠিয়ে দিইগে, ওঁরা

আরো কিছু হাতে নিয়ে আসবেন।— প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না।

ফকির

আর কেন। গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন

গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানি জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেল্লাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা খুব করেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও।

ফকির

আছে উপায়।

মাখন

পা জড়িয়ে

বলে দাও, বলে দাও, বঞ্চিত কোরো না।

ফকির

দিন-ভোর উপোস ক'রে থেকে —

মাখন

উপোস! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দুষ্টগ্রহ দিনে চারবার করে আহার জুটিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির

আচ্ছা, দুখানা রুটি—

মাখন

আরো একটু দয়া করেন যদি, দু'বাটি ক্ষীর !

ফকির

ভালো, তাই হবে ।

মাখন

আহা, কী করুণা প্রভুর ! তেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হলে পাঁঠাটাও—

ফকির

না না, ওটা থাক্ ।

মাখন

আচ্ছা, তবে থাক্, একটা দিন বৈ তো নয় । তা, কী করতে হবে বলুন । দেখুন, আমি মুখ্‌খু মানুষ, অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা মন্তর মুখ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে ।

ফকির

ভয় নেই, তোমার জন্যে সহজ করেই দিচ্ছি । গুরুর মূর্তি স্মরণ করে সারারাত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই— কোথাও নেই ।

মাখন

হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই ; এ হাতে নেই, ও হাতে নেই ; ট্যাঁকে নেই, থলিতে নেই ; ব্যাঙ্কে নেই, বাক্সোয় নেই। ঠিক সুরে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা, গুরুজি, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলার মতো শোনাচ্ছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়— সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফকির

মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন

আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল!

প্রস্থান

ফকিরের গান

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ
ওরে ও ভোলা মন।

ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে

ষষ্ঠী

দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার— আমার মাখন।

মুখে হাত বুলিয়ে

অমন চাঁদমুখখানা দাড়িগোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে। একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস, মাখন।

ফকির

সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম, সোঽহং ব্রহ্ম।

ষষ্ঠী

করেছিস কী দাদু, মন্তর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পড়িয়ে দিয়েছিস! সুর মোটা হয়ে গেছে!

ফকির

শিবোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং।

বামনদাস বাবুর প্রবেশ

বামনদাস

আরে আরে, আমাদের মাখন নাকি। খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল— নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্‌চায, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর দেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি। ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তপিস্যের মাহাত্মি বটে—

ষষ্ঠী

না ভাই, মাহাত্মি ভালো লাগ্‌ছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারি নাক, সে ছিল ভালো।

নিশিঠাকুর

ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই। অমন সব বোলচাল, মুনি হয়ে সব ভুলেছে বুঝি !

ভজহরি

দেখি দেখি মাখ্‌না, মুখটা দেখি।

চিমটি কেটে, চামড়া টেনে

না হে, এ মুখোশ নয়, ধাঁধা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই

কিনু, দেখ্‌ তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সত্যি কি না !

ফকির

উঃ উঃ !

চণ্ডী

পিঠে কিল মেরে

কেমন লাগল।

ফকির

উঃ !

চণ্ডী

ঐ তো, সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো ! মাথায় হুঁকোর জল ঢালি তবে, মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠী

আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ, ভাই। সাত বছর পরে ফিরে

এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দুখ্‌খু দিস্‌ নে— একটা কথা ক, নাহয় দুটো গাল দিলিই বা!

ফকির

আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাকছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার যে নাম থাক্‌, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন্দ স্বামী।

সকলের উচ্চহাস্য

চিনু

ওরে বাবা, ত্রাণকর্তা এলেন আমাদের। দেখ্‌ মাখ্‌না, ন্যাকামি করিস নে। ভাবছিস, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর দুই বউয়ের হাতে দুই কান জিম্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফকির

গুরো, হায় গুরো!

দুই স্ত্রীর প্রবেশ

প্রথমা

ঐ যে গো, মুখচোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফকির

মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া করো আমাকে।

সকলে

এই এই, করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে।

প্রথমা

ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বলিস কাকে !

দ্বিতীয়া

চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস, তোর মরণ হয় না !

ফকির

একটু ভালো করে আমাকে দেখে নিন।

প্রথমা

তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি ! তোমার দুধের দাঁত অনেকদিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছপাথর আছে ! তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরাও ভুলব।

দ্বিতীয়া

নাক মুচড়িয়ে দিয়ে

সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ডগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না— তোমার বিট্‌লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ্‌ লো ছুট্‌কি-- সেই তালের বড়ার ধামাটা।

প্রথমা

তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে !

দ্বিতীয়া

চক্কোত্তিমশায়, এই দেখে নাও— মিন্‌সে রান্নাঘরে ঢুকে

এনেছে বড়াশুদ্ধ আমাদের ধামা চুরি ক'রে।

সকলের হাস্য

কানু মণ্ডল

সে কি হয়! যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

ষষ্ঠী

ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ। ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে।

প্রথমা

ভালোমানুষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না— মা গো, সে কী দাঁতখিচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী

ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি— গোপনে আমাকে জানালে না কেন। তালের বড়ার অভাব কী।

ফকির

গুরো।

দ্বিতীয়া

কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধরে

এই দেখো তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ

মহাক্রোধে

দেখো, এ আমি কিছুতেই সইব না। এই ডাইনি দুটোকে ঘর থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টেঁকাতে পারব না। দেখছ তো, মাখন? কেবল ভালোমান্‌ষি করে তুই বউকে কী রকম করে বিগ্‌ড়িয়ে দিয়েছ!

ফকির

সর্বনাশ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি— আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি।

ষষ্ঠী

না ভাই, বেকবুল যেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি— তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন।

ফকির

দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের— আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষষ্ঠী

পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি। কেন এত জিদ করছ।

ফকির

খেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস

আবার কিন্তু কিসের !

ফকির

আমি আনি নি।

সকলের হাস্য

পাঁচু

তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেন না ?

ফকির

আজ্ঞে না।

সিধু

সে চেনে না তোমাকে ?

ফকির

আজ্ঞে না।

নকুল

এ যে আরব্য উপন্যাস।

সকলের হাস্য

ষষ্ঠী

যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো।

ফকির

কার ঘরে যাব ?

প্রথমা

মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমুখো! বলি আমাদের তুটিকে চেন তো?

ফকির

সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে

ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালাবন্ধ করে রাখো।

ফকির

গুরো!

সকলে

মিলে ঠেলাঠেলি

ওঠো, ওঠো বলছি।

সুধীর

বউ তুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েগুলিকে? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ নাকি।

ফকির

ও সর্বনাশ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না।

গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধরে

কিছুতেই না।

হরিশ উকিল

জান, আমি কে? পূর্ব-আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান? তোমার দুই স্ত্রী!

ফকির

এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ

আর, তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফকির

আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ

এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হলে মকদ্দমা চলবে বলে রাখলুম।

ফকির

বাপ্ রে! মকদ্দমা! পায়ে ধরি, একটু রাস্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী

যাবে কোথায়— কোন্ চুলোয়— যমের কোন্ দুয়ারে।

ফকির

গুরো!

হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়ল

হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম

ফকির

লাফিয়ে উঠে

এ কী, এ যে হৈমবতী! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

প্রথমা

ওলো, ওর সেই কাশীর বউ, এখনো মরে নি বুঝি।

মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ

মাখন

ধরা দিলেম— বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কল্‌সি। মা অঞ্জনা, কিষ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পুষ্প

ফকিরদা, তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?

ফকির

খুব বুঝেছি— এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প

বাছা মাখন, তোমার মস্ত সুবিধে আছে— তোমার ফুর্তি কেউ মারতে পারবে না। এ দুটিও নয়।

দুই স্ত্রী

ছি ছি, আর একটু হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল !

গড় হয়ে প্রণাম ক'রে

বাঁচালে এসে।

—

মূল্য ৩·৫০ টাকা